কালের কণ্ঠ
তারিখ : 04 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

এনসিটিবির পাঠ্য বইয়ে ভুলের নেপথ্যে...

শরীফুল আলম সুমন ▷

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চলতি বছরের পাঠ্য বইয়ে ছিল অসংখ্য ভুল আর অসংগতি। এর আগের বছরের বইগুলোতেও ছিল ভুল। কিন্তু এই ভুলের কমই সংশোধন হয়েছে। ফলে শিশুরা ভুলই পড়ে যাচ্ছে।

> জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ে ভুল আর অসংগতির সঙ্গে মানহীন প্রকাশনা

তা ছাড়া কয়েক বছর ধরে এনসিটিবি ৩২ থেকে ৩৫ কোটি বই মুদ্রণ করছে। সেই হিসাবে তারা বিশ্বের বড় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অথচ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, কাগজ-কালির ব্যবহার ও মান নিয়ন্ত্রণেও অস্বচ্ছতার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ফলে নিম্নমানের কাগজেই ছাপা হচ্ছে এসব বই। অথচ জড়িতদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনেও এনসিটিবির 'পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা'য় নানা অনিয়ম উঠে আসে।

গত ১৩ নভেম্বর টিআইবি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্য বই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া, কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

এনসিটিবির পাঠ্য বইয়ে ভুলের নেপথ্যে...

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। পাঠ্য বই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় কার্যাদেশ প্রদানে দুর্নীতি ও অনিয়ম, বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বে অবহেলা এবং অবৈধ আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়, এনসিটিবির সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি, মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও 'লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি এবং পরিদর্শন ও তদারকিতে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

চলতি বছরের তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটির ভুল নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। কবিতাটির প্রথম লাইন 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' গত বছরের বইয়ে ঠিক থাকলেও এবার ছাপা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে?' চতুর্থ লাইনে 'মানুষ হইতে হবে—এই তার পণ'-এর বদলে লেখা হয়েছে 'মানুষ হতেই হবে'। নবম লাইনে 'সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়'-এর 'চায়' শব্দটির পরিবর্তে ছাপা হয়েছে 'চাই' এবং পঞ্চদশ লাইনে 'মনে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান'-এর 'খাট' শব্দের বদলে ছাপা হয়েছে 'খাটো'। এভাবে একটি কবিতায়ই অনেক ভুল করা হয়েছে।

একটি কবিতায়ই এত ভুলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন বইয়ের ভুলের দায়ে ওএসডি হওয়া কর্মকর্তা লানা হুমায়রা খান। তিনি অর্থনীতি বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক। প্রেষণে এনসিটিবিতে ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকতা সবই অর্থনীতি বিষয়ের। অথচ তাঁকে দেওয়া হয়েছে বাংলা বইয়ের দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, লানা হুমায়রা যদি বাংলার শিক্ষক হতেন, তাহলে তিনি কোনোভাবেই এত বড় ভুল করতে পারতেন না।

গত এপ্রিলের হিসাব অনুযায়ী, এনসিটিবিতে বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব বিষয় বিশেষজ্ঞ আছেন ৬৪ জন। তবে তাঁদের মধ্যে দর্শন বিষয়েরই রয়েছেন ৯ জন। অথচ দর্শনের বইয়ের শিক্ষাক্রম করে না এনসিটিবি। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায়ও রয়েছেন চারজন করে বিশেষজ্ঞ। অথচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আলাদাভাবে এসব কোনো বিষয়ই নেই। এ ছাড়া হিসাববিজ্ঞানে চারজন বিশেষজ্ঞ থাকলেও নবম শ্রেণিতে মাত্র একটি বই করতে হয় এনসিটিবিকে। ফলে দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব নিতে হয় বিভিন্ন শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের বইয়ের। আর হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে করতে হচ্ছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই। অথচ ইংরেজি, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের অসংখ্য শিক্ষক রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, একটি বই রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। এরপর পরিমার্জনের দায়িত্বেও থাকে আরেক পরিষদ। তবে একটি বইয়ের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন বিশেষজ্ঞকে, যিনি মূলত ওই বইয়ের ভুলত্রুটির জন্য প্রধানত দায়ী।

সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষের বইয়ের জন্য মোট ৭৭ জন বিশেষজ্ঞ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে এনসিটিবির নিজস্ব ৬৪ জনের থেকে দায়িত্ব পালন করেন ৫২ জন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চার কর্মকর্তা এনসিটিবিতে সংযুক্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করেন। আর ১৮ জন বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প থেকে। বাকি দুজন এনসিটিবির আর্টিস্ট-কাম-ডিজাইনার। তবে এনসিটিবির প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিনকে হিসাব সামলানোর পাশাপাশি চলতি শিক্ষাবর্ষের দাখিল এবং মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের নবম শ্রেণির গণিত বইয়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। আর ঊর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তাও দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্যারিয়ার শিক্ষা বইয়ের।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ন চন্দ্র সাহা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মাধ্যমিকের বইগুলোর জন্য সাধারণত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ থাকে না। তবে আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষের বইগুলোর জন্য এ ব্যাপারে জোর দিয়েছি। এতে যতটা সম্ভব যেই বিষয়ের শিক্ষক তিনি সেই বিষয়টির দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া বইয়ের মান যাতে কোনো অবস্থায়ই খারাপ না হয় সে ব্যাপারে আমরা কঠোর মনিটরিং করছি।'

টিআইবির প্রতিবেদনের বিষয়ে এনটিসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা তাদের গবেষণা প্রতিবেদনটি দেখেছি। এ ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের বিষয়ে টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি), টেকনিক্যাল কমিটি, ভেটিং কমিটি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি, লেখক কমিটি গঠনের সময় যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা বা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়। পাঠ্য বইয়ে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার ভাষা ব্যবহার করার প্রবণতা এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। আগে পাঠ্য বইয়ে (সমাজ পাঠ) 'বাঙ্গালী' শব্দ ব্যবহার করা হতো না, বরং 'এ দেশের মানুষ' লেখা হতো। বর্তমান বইগুলোতে 'বাঙ্গালী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠ্য বইয়ে পরিবর্তনের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর দাবি ছিল মাদরাসার পাঠ্য বইয়ে 'হিন্দু, খ্রিস্টান বা বিদেশি বলে মনে হয়'—এমন নামের পরিবর্তে যেন 'সুন্দর ইসলামি নাম' ব্যবহার করা হয়। পাঠ্য বই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপও প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্য বই থেকে ১১টি 'অনৈসলামিক' কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনী এবং মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দ বাদ দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্য বই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। মাদরাসার ইংরেজি পাঠ্য বই থেকে হিন্দু, খ্রিস্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেওয়া হয়েছে। এমনকি এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তাঁর নাম মাদরাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

সম্পাদনার বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দল দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, ব্যক্তিগত আলাপ, ব্যক্তিগত এনজিও ব্যবসা ও মুদ্রণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল শোধরানো হলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার ২০টি ভুল দেখা যায়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, তা ছাড়া স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন নয়—এমন সদস্যকে প্রুফরিডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ট্রাই আউটের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও করা হয় না। কারিকুলাম অনুসরণ না করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয়। লেখকদের অজ্ঞাতে পাঠ্য বইয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি বইয়ের পেছনে প্রধানত দুই ধরনের দল থাকে। এর মধ্যে বিষয়বস্তু বা কনটেন্টের ভুলের জন্য লেখক দল দায়ী। আর ভাষা, বাক্য গঠন, বানান ভুলের জন্য সম্পাদনা দল দায়ী। লেখক দলে নানা তদবিরে অনেকে ঢুকে পড়ে। আবার সম্পাদনা দলেও অনেক দুর্বল লোক থাকে। সব মিলিয়ে পাঠ্য বইয়ে ভুল থেকে যায়। এ জন্য একটাই পথ, সব জায়গায় যোগ্য লোক দিতে হবে।'

টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়, পাঠ্য বইয়ের দরপত্র আহ্বানের পূর্বে প্রাক্কলিত দর অন্য কারো জানার কথা নয়। কিন্তু দরপত্র কমিটির একাংশ পছন্দের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এ ছাড়া মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমেও দরপত্র দাখিল করে। এনসিটিবির কোনো কোনো কর্মকর্তা বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানেরও মালিক। একই ব্যক্তির একাধিক প্রতিষ্ঠানকেও কাজ দেওয়া হয়। এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। টেকনিক্যাল কমিটির দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলেও তাদেরও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

গবেষণায় পাওয়া তথ্য উল্লেখ করে টিআইবি বলছে, দাপ্তরিক বা সরকারি আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণসংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মিত কাজেও এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী নেন। এ খাতে ২০১৭ সালে ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ২০১৬ সালে পাঁচ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সর্বশেষ মহাহিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এখনো তা নিষ্পত্তি হয়নি।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বিনা মূল্যের বই ছাপায় ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। মাধ্যমিকের বইয়ের দায়িত্বে থাকা ইন্সপেকশন এজেন্ট 'বালটিক বিডি লি.' ৩২টি প্রেসের নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা নেই বলে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। তারা নিম্নমানের কাগজে বই ছাপছে বলেও জানিয়েছে এনসিটিবিকে। ইন্সপেকশন এজেন্ট প্রতিবেদন দিলেও তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এনসিটিবি।

সূত্র জানায়, কয়েকটি পেপার মিলস ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেট করে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এনসিটিবি। এ ছাড়া কিছু মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের কাগজ কিনে গুদামজাত করেছে। চলতি মাসের শেষে বই সরবরাহের চাপ বেশি থাকায় এসব কাগজ দিয়ে ছাপানো শুরু করবে তারা; যাতে মানের দিকে কেউ নজর দিতে না পারে। এমনকি মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের দুই ইন্সপেকশন এজেন্টকেও ম্যানেজ করার পাঁয়তারা চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি ৪২ লাখ। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১৫ কোটি বইয়ের জন্য কাগজ সরবরাহ করে এনসিটিবি; যা দরপত্রের মাধ্যমে কেনে তারা। এনসিটিবির এবারের কেনা কাগজের মান যথাযথই রয়েছে। তবে বাকি ২০ কোটি বইয়ের মধ্যে অনেক কাজেই নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়। এমনকি অনেক প্রেসকে এনসিটিবি তাদের কেনা মানসম্পন্ন কাগজ সরবরাহ করলেও সেটা তারা বিক্রি করে নিম্নমানের কাগজ কিনে বই মুদ্রণের কাজ করে। যেসব বইয়ের কাগজ ৮০ জিএসএম থাকার কথা, সেখানে ৬০ থেকে ৬৫ জিএসএমের কাগজ ব্যবহার করা হয়।